পশ্চিমবঙ্গের নদী ফিরে দেখা

নদীকথা শুধু ভূগোল বা ইতিহাস নয়, নদী লালন করে মানুষেরই কতকথা। বাংলা তো প্রবাদেই নদীমাতৃক, যে নদী নিয়ে তাঁর দুঃখ সুখের বারমাস্যা, ঘরগেরস্তি। যে নদী শিল্প, পরিবহন বা নৌবাণিজ্য - বাংলার জীবন সমাজ অর্থনীতির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে নদী। জীবনদায়ী স্রোতধারা এখানে পবিত্র ও প্রণম্য।

গঙ্গা - ব্রহ্মপুত্র ও তাদের অসংখ্য উপনদী - শাখা নদীর জলের সাথে ভেসে আসা পলি সঞ্চিত হয়ে গড়ে উঠেছে এই বৃহত্তমবদ্বীপ। যত পলি জমেছে সাগরে ততই সরে গেছে আরও দক্ষিণে, ত্রমশ বদলে গেছে বদ্বীপের ভৌগোলিক রূপ। ব াংলার এই বিবর্তনআজও অব্যাহত। স্বাধীনতা - উত্তর পশ্চিমবঙ্গ পায়ে পায়ে অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় পেরিয়ে এল। গত তিন শতাব্দীতে বাংলার নদী মানচিত্র অনেক বদলে গেছে --- হারিয়ে গেছে অনেক নদী, অনেক স্রোতধারা খুঁজে নিয়েছে নতুন পথ। এ সব পরিবর্তন শুধু প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি। নদী অববাহিকা জুড়ে কৃষি ব্যবস্থার প্রসার ঘটার সাথে সাথে বিঘ্নিত হয়েছে নদীর গতিশীল ভারসাম্য। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শু হয়েছিল বন্যাপ্রবণ এলাকায় পাড় বাঁধ বা এমব্যাঙ্কমেন্ট নির্মাণের কাজ। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ্যাক্ট চালু হওয়ারপর বন্যাকে সম্পুর্ণ নিয়ন্ত্রণের এক অন্ধমোহে যত্রতত্র পাড় বাঁধ নির্মাণের কাজ শু হয়। ফলে দুই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় প্রথম নদীঅববাহিকার বৃষ্টির জল নদীখাতে গড়িয়ে পড়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়, দ্বিতীয়ত, বর্ষার জলে ভেসে আসা পলি যা আগে প্লাবন ভূমি ছড়িয়ে যেত তা নদীখাতে জমে যেতে থাকে। তিন শতাব্দী পর এখন লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে দামোদর, তিস্তা বা সুন্দরবনের বহু নদীর খাতপ্লাবন ভূমির থেকে উঁচু হয়ে উঠেছে। তাই বন্যার সময় পাড় বাঁধ ভাঙনে জল আর নদীতে ফেরার পথ পায় না। বর্ষার পলিসিক্ত জল পূর্বপুষরা, উইলকক্স যাকে বলেছেন ‘ওভার ফ্লো ইরিগেশন’ বা প্লাবন সেচ । এই অঞ্চলের নদীগুলির বাৎসরিক জল প্রবাহের ৮০ শতাংশই বয়ে যায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে। বিপুল জলস্রোত তখন নদীখাত উপচে প্লাবন ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে আর প্রবহমান স্রোতের টানে সারা বছর ধরে নদীখাতে জমা পলি ধুয়ে সাগরে চলে যায়। এই ভাবে বদ্বীপের নদী বেঁচে থাকে। অতীতে যে পলি প্লাবন ভূমিতে ছড়িয়ে যেত, পাড় বাঁধে বা এমব্যাঙ্কমেন্টের ফাঁসে বন্দী নদী এখন সেই পলিতেই ভরাট হয়ে গেছে। উইলকক্স্-এর চোখে পড়া বাঁধ তাই ‘শয়তানের শৃঙ্খল’। শৃঙ্খলিত নদী মজে যাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে বন্যা ও ভাঙনের প্রকোপ, হানা দিয়েছে ম্যালেরিয়া। উইলকক্স্, এডাম উইলিয়ামস বা সতীশচন্দ্র মজুমদার -- বুঝেছিলেন পাড় বাঁধে ক্ষতিকর প্রতিত্রিয়া। ১৯২৭ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছিলেন “Embankments in the riparian tract may for a time prevent overflow from the rivers, but would tend to raise the bed of rivers still further, and thus make the situation much worse in the long run.” (Rainfall and floods in North Bengal, 1870-1922p.6. Deptt of Irrigation, Bengal Govt.) ১৯৪২ সালে সতীশবাবু লিখেছিলেন পাড় বাঁধের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার অর্থ হল ‘আগামী প্রজন্মকে বন্ধক রেখে এই প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষা করা’। স্বাধীনতার পরও এসব কথা কেউ শোনেননি। নদী শাসনের পরম্পরা আজও চলেছে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার পশ্চিমি প্রযুক্তির সংকীর্ণ পথ ধরে। আজও নদীর পাড় ধরে নির্মিত প্রায় ১০,৫০০ কিমি দীর্ঘ প

াড়বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করে রাজ্য সেচদপ্তর। একথা সত্য যে এই বাঁধগুলি ভেঙে ফেলে নদীকে আবার মুক্ত করে দেওয়া এখনই সম্ভব নয়, কারণ তাতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম - শহরের বসতি বিপন্ন হবে। তবে পরিকল্পিত ভাবে প্লাবনভূমির বিভিন্ন অংশে পর্যায়ক্রমে বন্যার জল ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। তাতে একাধারে নদীখাত গভীর হবে, প্লাবনভূমিও নতুন পলিতে ফিরে পাবে তার হারানো উর্বরতা। এজন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা। কিন্তু স্বাধীনতা - উত্তর পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন নদী পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়নি।

রেল ও সড়ক পথও নদী চলার পথে বড় বাধা। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় রেল ও সড়ক ব্যবস্থার প্রসারের সাথে বেড়েছে বন্যা ও মালেরিয়ার প্রকোপ। ১৮৫৯ সালে হাওড়া - বর্ধমান রেললাইন চালু হয়। দক্ষিণ - থেকে উত্তরে প্রসারিত এই রেলপথনিম্ন দামোদর অববাহিকার নিকাশি ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। ফলে হুগলি ও বর্ধমান জেলায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ম্যালেরিয়ায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এ প্রসঙ্গে মেঘনাদ সাহা ১৯৩৩ সালে লিখেছিলেন--- “If there be anything like justice in the world, people of Burdwan are entitled to compensation from the parties concerned, for all these terrible inflictions on them.” প্রায় একই মত ব্যক্ত করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও, তিনি ১৯২৭ সালে লিখেছিলেন--- Railway embankments have occasionally acted as barriers for holding of floods. ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারদের একটি গোষ্ঠী চাইছিলেন বাংলার বুক চিরে রেল ও সড়ক পথ নির্মিত হোক যাতে বাংলার কাঁচামাল দ্রুত কলকাতা পার হয়ে ইংল্যান্ড পৌঁছে যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যও ফিরে আসে। বাংলা তখন একাধারে কাঁচামালের উৎস ও বাজার। স্যার আর্থার কটনের মতো নদী বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বুঝেছিলেন যে রেল ও সড়ক পথ জলের নিকাশি পথকে ব্যাহত করবে --- তাই জলপথে বাণিজ্য করাই কাম্য। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার বুঝতে পারে শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থে নয় বিদ্রোহ দমনে ও সেনাবাহিনী দ্রুত যাতায়াতের জন্য চাইরেল ও সড়ক পথ। জঙ্গল মহলের শালগাছ যথেচ্ছ ভাবে কেটে তৈরি হলরেলের স্লিপার। ফলে দ্রুত বদলে গেল বাংলার ভূগোল।

বাংলার নদী নিয়ে একটি সামগ্রিক ইতিহাস কিন্তু আজও লেখা হয়নি। তবু কিছুটা চেষ্টা হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার আগেই। স্বাধীনতার পর বাংলার নদী সম্পর্কে প্রকাশিত একমাত্র উল্লেখযোগ্য বইটির শিরোনাম --- বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা, লেখক কপিল ভট্টাচার্য (১৯৫৯)। এছাড়া প্রকাশিত অন্য একটি বই হল তপোব্রত সান্যালের (২০০০) গঙ্গা তত্ত্ব ও তথ্য। দুইটি বইতেই পশ্চিমবঙ্গের নদী নিয়ে নানা কথা আলোচিত হলেও আরও অনেক কথাই অব্যক্ত থেকে গেছে। বাংলার নদী ও তার নানা দিক নিয়ে প্রথম প্রামাণ্য বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪২ সালে, যার শিরোনাম ‘রিভারস অব বেঙ্গল ডেল্টা’ -- লেখক তৎকালীন সেচ বিভাগের মুখ্য বাস্তুকার সুবোধচন্দ্র মজুমদার। ‘অন্য যে দুটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য তা হল রাধাকমল মুখার্জীর (১৯৩৮) দ্য চেঞ্জিং ফেস অব বেঙ্গল আর কাননগোপাল বাগচীর (১৯৪৪) গ্যাঞ্জেস ডেল্টা। আরও আগে নদী নিয়ে যে সব রিপোর্ট ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল তা সবই সাহেব - ইঞ্জিনিয়ারদের রচনা। তার মধ্যে যেসব রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল, জেমস রেনেলের (১৭৮১) এ্যান এ্যাকাউন্ট অব গ্যাঞ্জেস এন্ড ব্রহ্মপুত্র রিভার, জেমস ফারগুসনের (১৮৩৬) অন রিসেন্ট চেঞ্জেস ইন দ্য - ডেল্টা অব গ্যাঞ্জেস, ডব্লিউ। এস। শেরউইলের (১৮৫৮) রিপোর্ট অন দ্য রিভারস অব বেঙ্গল, ডব্লিউ. এ. ইংলিশের (১৯০৯) ক্যানালস এ্যান্ড ফ্লাড ব্যাঙ্কস অব বেঙ্গল, এফ. সি. হার্স্টের (১৯১৫) রিপোর্ট অন্ নদিয়া রিভারস্, স্টিভেনসন - মুর কমিটির (১৯১৯) রিপোর্ট অন্ দ্য হুগলি রিভার এ্যান্ড ইটস হেডওয়াটারস, এ্যাডাম উইলিয়ামসের (১৯১৯) হিস্টারি অব দ্য রিভারস ইন্ দা গ্যাঞ্জেস থ্রু বেঙ্গল। এই সব রচনার পাশাপাশি সাহেবদেরই উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল বহু নদী মানচিত্র। ওই সব মানচিত্র নির্মাতাদের মধ্যে দ্য এ্যানভিল (১৭৫২) (D’Anville) রেনেল (১৭৮১)মে (১৮২৪) ও হান্টার (১৮৭৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহেবরা যে বাংলার নদী - সংস্কৃতি সব বুঝতেন তা নয়। তবু ইতিহাসের দায়েই ঔপনিবেশিক গদ্য পাঠ করতে হয়। অধিকাংশ সাহেব - ইঞ্জিনিয়ারদের লক্ষ্য ছিল কীভাবে নদীপথকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যায়--- তার পথ খোঁজা। নদী সম্পদে বাংলা তখন ধনী ও গরবিনী। অনেক নদী বিশেষজ্ঞ কিন্তু তখনই বুঝেছিলেন --- শুকিয়ে মজে যাচ্ছে অনেক নদী, নদী বিত্তের বাংলায় বদলেযাচ্ছে পরিবশে প্রকৃতির রূপরেখা -- সেই ঔপনিবেশিক পর্বেই। আর এই পরিবর্তন যে

সর্বাংশে প্রাকৃতিক কারণে ঘটছে না তা প্রথম বুঝেছিলেন ডব্লিউ. এ. ইংলিশ (১৯০৯)। প্রাজ্ঞ সেই নদী বিশেষজ্ঞ লিখেছিলেন --- We construct reservoirs to store water and we abstract water from streams and apply it to irrigation of land without any regard to the apparent intention of Nature. We protect the banks of rivers from natural erosions and we dredge up sand and mud from the places in which Nature intended it to remain. There are, of course, limits within which we must confine our efforts, and success depends on a due apprehension of these limits and on a just sense of proportion.

বাংলার নদী নিয়ে সাহেবদের গবেষণার নেপথ্যে সাহেবদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ নিহিত ছিল। ক্রমশ মজে যাওয়া নদীর স্রোত ও বিপন্ন নৌবাণিজ্য নিয়ে তাদের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। ইংরেজদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল -- কলকাতা বন্দরের ক্রমহ্রাসমান নাব্যতা -- যে সমস্যা নিয়ে আজও বিব্রত। একথাও সত্য যে সাহেবদের নদী গবেষণার মধ্যে কোন গাফিলতি ছিল না --- উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। আরও অনেকের মতো মেজর হার্স্টও বাংলার নদীর গতি প্রকৃতি বুঝতে চেয়েছিলেন গভীর মনোনিবেশ করে --- খুঁজেছিলেন নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণ ও তাকে স্রোতস্বিনী রাখার উপায়। তিনিই প্রথম নদীর গতিপরিবর্তনের ভূতাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল উত্তরে জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণ বরিশাল পর্যন্ত বদ্বীপের পলির নীচের শিলাস্তরে একটিফাটল বা চ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে। উপরের পলিস্তর ওই চ্যুতি বরাবর ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে, ফলে বদলে যাচ্ছে ভূমির ঢাল। অনেকের ধারণা এই কারণেই ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ গঙ্গার মূল স্রোত ভাগীরথীর খাত ছেড়ে পূর্বমুখী পদ্মার খাত ধরে বইতে শু করে। ১৭৮৭ সালে তিস্তা বা ১৮৩০ সালে যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীর গতিপরিবর্তনও একই কারণে ঘটেছিল। হার্স্ট গভীর অনুসন্ধান করেছিলেন হুগলি নদীর মজে যাওয়ার কারণ। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন --- বছরের বিভিন্ন সময় নদীতে জল ও পলির পরিমাণ, নদীর বুক চিরে সেতুওজেটি নির্মণের প্রতিক্রিয়া, জলের গভীরতা ও চরের অবস্থান এবং নদীর অববাহিকা জুড়ে মানুষের নানা কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে স্টিভেনশন্ - মুর কমিটির (১৯১৯) রিপোর্টও একটি অসাধারণ প্রামাণ্য দলিল বলে স্বীকৃত।

বাংলার নদী সদাই চঞ্চল --- ক্রমাগত গতিপথ বদলে নেয়। জলের স্রোতে ভেসে আসে প্রচুর পরিমাণ পলি আর সেই পলিতেই দ্ধ হয়ে যায় নদীর চলার পথ --- তখন নদী পাড় ভেঙে নতুন পথ খুঁজে নেয়। উত্তরবঙ্গের পূর্ব সীমান্তে সংকোশ নদী থেকে পশ্চিমে মেচি নদী পর্যন্ত সব খাতই এখন পাথর বালিতে অবদ্ধ। একই ছবি দক্ষিণবঙ্গেও --- পাগলা, বাঁশলই, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, ময়ুরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাই, রূপনারায়ণ, জলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী, বিদ্যাধরী, সরস্বতী ও আদিগঙ্গা। একই ছবি দক্ষিণবঙ্গেও -- পাগলা, বাঁশলই, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, ময়ুরাক্ষী, অজয়, দামোদর,, দ্বারকেশ্বর, শিলাই, রূপনায়ারণ, জলঙ্গী, চুণী, ইছামতী, বিদ্যাধরী, সরস্বতী, আদিগঙ্গা --- সব নদী এখন মৃতপ্রায়। বর্ষা জলস্রোত ফি বছর দুকুল ছাপিয়ে ভাসিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম। বানভাসি মানুষ তখন আশ্রয়ের সন্ধানে দিশেহারা। বর্ষার পর আসে শুখা মরশুম --- তখন সেচের জলের জন্য হাহাকার, পানীয় জলের সংকট দেখা দেয় বহুগ্রামে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বুঝেছিলেন বর্ষায় উদ্বৃত্ত জল আর তারপর শুখা মরশুমে জলের ঘাটতি --- বাংলার মূল সমস্যা। তিনি চেয়েছিলেন - সেদপ্তরের পরিবর্তে একটি পৃথক নদী গবেষণা দপ্তর। অধ্যাপক সাহা লিখেছিলেন -- The Government of Bengal indeed maintain an irrigation department, but irrigation is not the problem of Bengal, which does not suffer from shortage of water but from excess and unequal distribution of water. What we want in Bengal is not an irrigation department, but a river training organization (P.24) । তার স্বপ্নস অব বেঙ্গল অথর কাননগোপাল বাগচীর (১৯৪৪) গ্যাঞ্জেস ডেল্টা। আরও আগে নদী নিয়ে বে বাস্তবায়িত হয় নি। হরিণঘাটার নদী বিজ্ঞান মন্দির এখন নদীর মতোই মুমূর্ষু। নদী নিয়ে গবেষণার জন্য আমাদের পুণের কেন্দ্রীয় জল ও নদীর গবেষণাগারের দারস্থ হতে হয়। সঠিক নদী মানচিত্র পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় জরিপ বিভাগ বা ন্যাশানাল অ্যাটলাসের আনুকূল্যে এপর্যন্ত যে সব মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছে --- তাতে অনেক নদী খুঁজে পাওয়া যায় না। হায়দ্রাবাদের কেন্দ্রীয়দূর সর্বেক্ষণ কেন্দ্রে (National Remote Sensing Agency) উপগ্রহ চিত্র দুর্মূল্য এবং সাধারণের অধরা। ফলে নদী গবেষকরা অসহায়। অথচ 'নদী উৎসব' এখন বাৎসরিক শহুরে হুজুগ। নদীমাতৃক এই রাজ্যে পৃথক নদী মন্ত্রক নেই কেন -- এ প্রশ্নের উত্তর প্রয়াত পান্নালাল দাশগুপ্ত তাঁর জীবদ্দশায় পাননি।

সেই ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে যথেচ্ছ নদীর শাসনের যে উত্তরাধিকার আমরা অর্জন করেছিলাম তা আজও অব্যাহত। জহরলাল নেহে স্বপ্ন দেখেছিলেন -- বড় বাঁধগুলি হবে ভারতের উন্নতির দেবালয়। তাঁর সেই স্বপ্নকে রূপ দিতে দেশজুড়ে অনেক নদীর বুক চিরে তৈরি হল বহু বড় বাঁধ -- জলাধারের নীচে হারিয়ে গেল বহু প্রাণ, বাস্তুচ্যুত হলেন অন্তত পাঁচ কোটি মানুষ। ১৯৪৮ সালে হিরাকুঁদ বাঁধের জন্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্দেশ্যে নেহে বলেছিলেন --- "If are to suffer, you should suffer in the interest of the country." বড় বাঁধ ও উন্নয়নের স্বপ্ন রূপায়ণের অন্যতম প্রকল্প হল ডি ভি সি। আমেরিকার টেনেসি নদীর সাথে দামোদরের কোনচরিত্রগত মিল না থাকা সত্ত্বেও অন্ধমোহে টি ভি এ-র মডেল অনুসরণে হয়েছিল একটি বন্যা অনুসন্ধান কমিটি। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই কমিটি একদিকে দামোদর অববাহিকার উজানে কয়েকটি জলাধার নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিলেন, অন্যদিকে বর্ধমানের সিলনা থেকে একটি খাল কেটে দামোদরের উদ্বৃত্ত জল দ্বারকেশ্বর নদীর খাতে বইতে দিতে চেয়েছিলেন। শেষোক্ত পরামর্শটি রূপায়িত না হলেও পরবর্তীকালে দামোদরের উজানে পাঁচটি জলধারা নির্মিত হয়েছে কিন্তু নিম্ন দামোদর অববাহিকার মানুষ বন্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় নি। ডি. ভি. সি, মশানজোড় বা কংসাবতী প্রতিটি জলাধারই নির্মিত হয়েছে রাজ্যের পশ্চিম সীমানায় বা প্রতিবেশি রাজ্য ঝাড়খণ্ডে ফলে বাঁধের ভাটিতে অনিয়ন্ত্রিত এলাকার অতিবর্ষণ জনিত জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। গত পাঁচ দশকে পলি জমে জলাধারগুলির ধারণ ক্ষমতাও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।। তাই প্রতাশা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে নি। জলাধার থেকে বাষ্পীভবন বা সেচ খালের নীচের মাটিতে জলসোষণের ফলে সংরক্ষিত জলের ৩৫ শতাংশ মাত্র ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে মাটির নীচের জলভাণ্ডার -- এ যেনস্থায়ী আমানত ভাঙিয়ে এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের দিনযাপন। কেউ মনে রাখেন না যে মাটির নীচের জলভাণ্ডারই শীত - গ্রীষ্মের অনাবৃষ্টির সময় নদীকে সজীব রাখে। ১৯৭০ এর দশক থেকে উচ্চফলনশীন ধান চাষের সাথে সাথে বেড়েছে জলের চাহিদা। বর্ষার জল দীঘি পুকুরে সংরক্ষণ করার চিরায়ত সংস্কৃতি এখন চূড়ান্ত অবহেলিত। বোনোর ধানের আগ্রাসী জলের চাহিদা মেটাতেই রিক্ত হয়ে যাচ্ছেআমাদের জলভাণ্ডার। সংশয়ী মনে প্রশ্ন জাগে শুখা মরশুমে ধানচাশের সজল বিলাসিতা আমরা আর কতদিন দেখাতে পারব? একথা অনেকেই জানেন, ১৫ কুইন্টাল বোরো ধান ফলাতে যে - পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয়, তা দিয়ে ৩৬ কুইন্টাল গম বা ২০ কুইন্টাল ডাল উৎপাদন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ, ভূমি ক্ষেত্র মজুরের সংখ্যা ৭৪ লক্ষ। বিকল্পকৃষিতে এঁদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের প্রায় ৬২ শতাংশ এলাকা কৃষি জমি আর সেই জমির প্রায় ৯০ শতাংশে ধান চাষ করা হয়। এই বিস্তীর্ণ কৃষি জমিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই তাই সীমাহীন শোষণে মাটির নীচে জলভাণ্ডার শুধু রিক্ত হয়নি, বিঘ্নিত হয়েছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সূত্রগুলি। ভৌম জলস্তরে এখন আর্সেনিক বা ফ্লুওয়াইডের বিষ। নদীর জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘাটতি ও কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য, ফলে কমে যাচ্ছে জলের জীববৈচিত্র্য। প্রকৃতির নানা অস্থিরতার ঝাপটা এসে পড়ছে মানুষের জীবনে। পরিবেশের নানা সমস্যা, বন্যা, ভাঙন নদীর গতিপরিবর্তন বা মজে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ ও কৌতূহল বাড়ছে। এই সময়ের নদীগবেষকরা তাদের গবেষণার ফল নিয়ে সাধারণত ইংরাজী ভাষায় জটিল প্রবন্ধ রচনা করেন -- যা সাধারণ মানুষের অধরা থেকে যায়। অন্য একটি গুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমকালীন গবেষণার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ - নদীর আন্তঃসম্পর্কটি অনুপস্থিত। অথচ আমাদের নদী গবেষণার ইতিহাস অন্য কথা বলে। ঔপনিবেশিক অবস্থার মধ্যেই নদী নিয়ে অন্য কথা ভেবেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহা, রাধাকমল মুখার্জী, নীহাররঞ্জন রায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, কাননগোপাল বাগচী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অর্থাৎ বাংলার নদী ভাবনার এক দেশজ ধারাও ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা - উত্তরকালে কপিল ভট্টাচার্য ছাড়া বাংলার নদী নিয়ে অন্য কেউ বিশেষ ভাবেন নি। প্রযুক্তিবিদ্‌রা নদীকে শাসন করতে চেয়েছেন প্রকৃতি - মানুষের উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা না ভেবেই। একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে গঙ্গার জল খালপথে ভাগীরথী - হুগলি নদীতে এনে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছিল। ফরাক্কার জলে হুগলি নদীতে লবণতার মাত্রা কিছুটা কমলেও পলিসঞ্চয় কমে নি। এখনওপ্রতিবছর মোহনা থেকে প্রায় ২,১০ কোটি ঘন মিটার পলি অপসারণ করতে হয়। অথচ ব্যারেজের উজানে প্রতি বছর প্রায় ৩০ কোটিটন পলি জমে যাচ্ছে। পলিতে দ্ধ গঙ্গা পাড় ভেঙে নতুন পথ খুঁজছে। গঙ্গা হয়তো অচিরেই ফরাক্কা ব্যারেজকেএড়িয় নতুন চলার পথকরে নেবে --- এমন আশঙ্কা এখন সবার মনে। জল ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে পলি ব্যবস্থাপনার উপর --

এই সহজ কথাটি সংকীর্ণ প্রযুক্তিবিদ্যার ধারণার অতীত ছিল। গঙ্গার মতো বিশাল নদীর চলার পথ দ্ধ করে জলকে অন্যপথে ঘুরিয়ে দিলে ভাসমান পলির চলার স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হয় -- এই সহজ কথাটি আমরা তিন দশক আগে বুঝি নি, আর সেই না বোঝার মাশুল দিতে মালদহে কয়েক লক্ষ মানুষ ভাঙন - দুর্গত ও ঘরহারা।
বাংলার নদী গবেষণার একটি গুত্বপূর্ণ অধ্যায় শু হয়েছিল ঐতিহাসিক রাধাকমল মুখার্জী ও নীহাররঞ্জন রায়ের হাত ধরে। কিন্তু পরিব্রাজকের বর্ণনা, প্রাচীন মানচিত্র পাঠ বা মাটির নীচ থেকে পাওয়া পুরাবস্তু ব্লিষেণ করলেই নদীর ইতিহাস পুরোপুরি বোঝা যায় না; জানতে হয় ওই অঞ্চলের ভূতত্ত্ব, পলিস্তরের চিত্র। পর্যবেক্ষণ করতে হয় ভূপ্রকৃতি ও উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া নানা তথ্য। কিন্তু এসব বিষয় ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত নয় তাই বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান অনেক সময় ভূগোলের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়েছে, আর ভূগোলবিদ্‌রাও ইতিহাসের নানা জটিলতা বুঝতে পারেন নি। তাই ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভূগোল ভূতত্ত্ব, দূরসর্বেক্ষণ বিজ্ঞান (Remote Sensing) --- ইত্যাদি নানা বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারলে বাংলার সঠিক নদী - ইতিহাস রচনা করা যাবে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের ভূতত্ত্ব ষিয়ে গবেষণা খুবই অর্বাচীন। মাত্র পাঁচ দশক আগে থেকে খনিজ তেলের অনুসন্ধানের সময় পলি স্তরের যে ইতিহাস উন্মোচিত হতে শু করে -- সেখান থেকেই এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা। উপগ্রহচিত্র ব্লিষেণ নদী বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এইসব আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে এখনও অন্তর্ভুক্ত নয় আবার ভূগোলের পাঠ্যক্রমেও এসবের সামান্য অংশই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে নদী গবেষণাও সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার দায়িত্ব পালন করেন প্রযুক্তিবিদ্‌রা আর অধীত প্রযুক্তবিদ্যা চালিত হয় পশ্চিমি বিজ্ঞানের সংকীর্ণ পথ ধরে। মনে রাখা দরকার ইউরোপ বা আমেরিকা নদীগুলির সাথে ভারতীয় নদীগুলির মিল যতটা অমিল তার তুলনায় বেশি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এশিয়ার নদীগুলির জলে বছরে প্রায় ৬৩৫ কোটি টন পলি ভেসে আসে আর ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার নদীগুলি বহন করে যথাক্রমে ২৩ ও ১০২ কোটি টন পলি। বাৎসরিক জল প্রবাহের প্রকৃতিও বিভিন্ন ধরনের। এই উপমহাদেশে নদীগুলির বাৎসরিক জলপ্রবাহের প্রায় ৮০ শতাংশ বয়ে যায় জুলাই, অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে আর পশ্চিমি নদীগুলিতে সারা বছর প্রায় জলপ্রবাহে এত তারতম্য ঘটে না। তাই নদী শাসনের পশ্চিমিপ্রযুক্তি বিদ্যা এদেশে অনেকটাই অচল। এছাড়া মনে রাখা দরকার নবগঠিত গঙ্গার - ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের পলিস্তর এখনও নরম, জমাট বেঁধে ওঠে নি, ভূমিগঠনের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। সর্বোপরি, অববাহিকার আয়তন, অববাহিকায় কৃষিজমি ও বনাঞ্চলের ব্যাপ্তি; প্রবহমান জল ও পলির পরিমাণ, নদী ঢাল, জোয়ার - ভাঁটার ওঠানামা ইত্যাদি নানা কারণের উপর নদী গতিশীল ভারসাম্য নির্ভর করে। ইংলিশ সাহেব সঠিকভাবেই বলেছিলেন --- 'আমরা নদী শাসনের অজুহাতে যা কি ছু করি তার সবই প্রকারান্তরে প্রকৃতির বিদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা আমাদের এই সব কার্য কলাপের একটি সীমা থাকা প্রয়োজন, আর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে সেই লক্ষ্মণ রেখাটি সঠিকভাবে চিহিত করার মধ্যে। অর্থাৎ নদীর সাথে সহাবস্থানই আমাদের অস্তিত্বের শর্ত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com